একহাতে তার গানের থালা অন্যহাতে গোলা

পাঁচু রায়

(সংগীতের স্বরনিনাদে সংসার প্রতিধবনিত। অনন্ত ভরিয়া, আকাশ পুরিয়া, ওই যে অনন্ত নাদ উঠিয়াছে, সংগীতের ধববনি ব্যতীত ত াহকে আর কি বলিব ? বিহঙ্গের কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, বায়ুর নি স্বনে, তবল্লরির মর্মর স্বরে, মেঘের গম্ভীর নির্ঘোষে, নির্ঝরিনীর কুলুকুলুধবনিতে--- সংগীতের সুললিত তান কোথায় নাই ? সিংহের গর্জনে, হস্তীর নিষাদস্বরে, অশ্বের হ্রেষায়, রাসভের ষড়জ চিৎকারে, গাভির হাম্বারবে, ছাগের গান্ধার ধবনিতে, বৃষের ঋষভ-শব্দে, মার্জারের মিউমিউ সুরে সংগীতের তান বিদ্যমান নাই কি ? অস্ফুট শৈশব কণ্ঠে যে অস্ফুষ্ট স্বরলহরি উত্থিত হয়, ভাষাহীন অসভ্য বন্যজাতির অসম্বন্ধ- স্বরে যে ভাব ব্যক্ত হয় সংগীতের তান তাহার মধ্যেও শুনিতে পাই না কি?)

১৯৫০ সালে প্রকাশিত দুর্গাদাস লাহিড়ির বাঙালির গান শীর্ষক সঙ্কলনের ভূমিকার শুটা ছিল এই রকম। তখন আমাদের দেশে ইংরেজ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধি আন্দোলন। সেই সময় বাঙালির গান নিয়ে এমন চর্চা এবং অন্যবিধ চর্চার অনুপস্থিতি বুঝিয়ে দেয়, কলোনিয়াল লিগ্যারিস নানাবিধ ভিত্তি তখন স্থাপিত হলেও, সঙ্গীতছিল তখনও এই লিগ্যাসির বাইরের এজেণ্ডা। বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে দেখা দেওয়ার পর শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা ইত্যাদি নানান বিষয়ে সাম্রাজ্যব াদি অনুপ্রবেশের আয়োজন ঘটালেও সঙ্গীতেরজগতে তেমনভাবে সাম্রাজ্যবাদের ঘরানার দাপট লক্ষ্য করা যায় নি। যেমনটা হয়ে ছিল থিয়েটার, খেলাধূলা এবং অনিবার্যভাবেই সিনেমা শিল্পে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন দিনযাপনের মধ্যেও এসে গিয়েছিল সা ম্রাজ্যবাদি দাপট। অথচ সঙ্গীতের এলাকায় কিছু পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সুর সম্ভার এসে গেলেও আগ্রাসী তেমন আয়োজন ছিল না। ররঞ্চ বলা ভাল, প্রাচ্যের সঙ্গীত চর্চা বহুক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের রসায়নে ঋদ্ধ হয়ে বাংলাগানকে আমজনতার কাচে অনেক বেশী গ্রহণীয় করে তুলেছিল। শোনার এবং দেখার অভ্যাসে কোনও রকম যৌন নিপীড়ন না ঘটিয়েই এবং সেই অভ্যাসের গভীরতা বৃদ্ধি করেই বহুক্ষেত্রে। তবে ইংরেজরা আসার ফলে বাংলাগানের কোনও পরিবর্তন হয়নি একথা বলা ভুল। ইংরেজরা এদেশে প্রসেনিয়াম থিয়েট ার নিয়ে আসে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে বা শাসনের সুবিধার জন্য। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, এখন যেখানে মার্টিন বার্ণ কম্প ানীয় অফিস লালবাজারের উল্টোদিকে,ওলড গ্রে হাউস নামে প্রথম প্রসেনিয়াম গড়ে ওঠে ইংরেজদের ত ত্বাবধানে যা ১৭৫৬ সালের জুন মাসে সিরাজদৌল্লার কলকাতা আত্রমনের সময় শেষ হয়ে যায়। ত্রিকেট, ফুটবল, গল্ফ এবং লন টেনিস ইংরেজরা সুপরিকল্পিতভ াবেএদেশে নিয়ে আসে। এই খেলাগুলোর মধ্যে গল্ফ একেবারে উচচকোটি লোকেদের জন্য। বলা যায়, দীর্ঘদিন একেবারে ওপরতলার সাদা চামড়ার সাহেবরা ছাড়া গল্ফ খেলার চল ছিল না। সাহেব এবং সাহেবদের একেবারে ঝিস্ত ভারতীয়দের জন্য এনেছিল লন টেনিস। এই দুই খেলার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজস্ব ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেছিল। প্রথমত এই খেলাটা তারাই খেলতে পারে, ক ালোচামড়ার সাধারন ভারতীয়রা পারে না। অতএব তারা সুপিরিয়র। অন্যদিকে লন টেনিস খেলার কালোচামড়ার বল বয় এবং গল্ফ খেলার সরঞ্জাম বহনকারী কালো চামড়ার নীরব দাসসদৃশ ব্যক্তিটির অনিবার্য উপস্থিতি ঔপনিবেশিক রাজনীতির পরিপূরক হিসেবে ক াজ করেছিল। ত্রিকেটকে তারা লাগিয়েছিল অধীনস্থ ভারতীয়দের সাহেবি আদব কায়দা শেখানোর কাজে, তাদের নিজস্ব একটা খেলা নতুনভাবে তৈরি করার কাজে এবং এসবের যোগফলে ঔপনিবেশিক রাজনীতি রক্ষাকারী ভারতীয় স্তম্ভ নির্মাণের কাজে মূলত। ফুটবলট াকে তারা আমজনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য সেখানেও প্রাথমিকভাবে সাহেবরাই ছিল শ্রেষ্ঠ। থিয়েটার এবং ক্রীড় াজগতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঘটায় নিজেদের শাসনেরসরাসরি সুবিধার জন্য। কিন্তু গানের জগতে তারা এইরকম কোনও অনুপ্রবেশ ঘটায়নি। বেশকিছু বাদ্যযন্ত্র তাঁরা নিয়ে এসেছিল। পিয়ানো, হারমোনিয়াম, ভাওলিন ইত্যাদি ব্রিটিশ সাম্র াজ্য বাদিদেরই অবদান। এবং এইসব বাজনার ভিতর দিয়ে গল্ফ, লন টেনিস, ত্রিকেট, থিয়েটার এর মতনই , ইংরেজদের অনুগত নব্য এলিটসমাজ নির্মাণ সহজতর হয়েছিল ঔপনিবেশিক বাজার সুরকার ব্যাপারে এরাই হল সাংস্কৃতিক সেনাপতি। গানের ব্যাপারে এরা খুব একটা নাক যে গলায়নি তার কারণ তখন শহরের সঙ্গীত ছিল ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণে। এবং ভূস্বামীরা তখন তাদের শ্রেণীস্বার্থে এবং দীর্ঘদিন নবানী শাসনে এক ধরনের হীনমন্যতায় আত্রান্ত থাকার পর ইংরেজদের অনুগত ভৃত্যই ছিল বলা যায়। সেই সঙ্গীতের মর্মবাণী, উপস্থাপনায় ভঙ্গি এবং শ্রোতৃমণ্ডলী কোনওটাই ইংরেজদের মাধাব্যাথার কারণ হয়ে ওঠেনি তখন।

এখানে তৃতীয় - চতুর্থ শতাব্দি থেকে উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের প্রচলন শু হয়। তবে দশম শতাব্দি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যে ব াংলার অভিজাত সম্প্রদায় এবং ভূস্বামীরা তাদের জন্য আয়োজিত মাইফিল এ উত্তর ভারত থেকে আসা রাগসঙ্গীতের প্রসার ঘটান। তখন ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও টপখেয়ালে ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়ের ?সময় আচ্ছন্ন হতে থাকে সুতানুটির বিভিন্ন বৃত্তির লোকজনও ধীরে ধীরে এই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

এর পাশাপাশি বা এর আগে থেকেই আমাদের এখানে ছিল নানাবিধ লোকগীতির সমাহার। সেখানের মেজাজ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দ াস্যতা বশ্যতার লেশমাত্র ছিল না সেইসব লোকসঙ্গীতে। কবিগান, দাঁড়াকবি, হাফ আখড়াই, পাঁচালি, ঝুমুর ইত্যাদি ছিল repartee জাতীয় গানের লড়াইয়ের মতন, যেখানে গানের ভঙ্গিমায় একটা অন্যরকম সংগ্রামী মেজাজ আসত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর মুদ্রিত নয়নে বাস্তয়ন করার অবকাশ থাকত না। আলকাপ, গম্ভীরা, ভাদু, টুসু ভাওয়াই ইত্যাদি গানের ভিতর দিয়ে লোক সমাজের একটা শরীর স্পষ্ট হয়ে উঠত। এমনকি মার্গ সঙ্গীত, প্রবন্ধ সঙ্গীত -- ধ্রুপদ থেকে যার শু সেও ঠুমরি ভজনের ভিতর দিয়ে লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে অন্যমাত্রায় বিকশিত হয়। তথাপি লোকসঙ্গীত ব্রিটিশ শাসকদের প্রাথমিক শির পীড়ার কারণ ছিল না। কেননা এর বসবাস ছিল গ্রামে, কোনও অবস্থাতেই শহরে নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পন্যবাজার দখলের ক্ষমতা তখনও মূলত শহর াঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাজার এবং বাজারকে ঘিরে বানিয়া সম্প্রদায় তখন মূলত ছিল ব্রিটিশ বণিকের টার্গেট।

কিন্তু আধুনিক বিশ্বায়নের টার্গেট সব কিছু। যেখানে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই, যে গ্রামে পাইপলাইন ওয়াটার হয়তে আগামী একশ বছরেও স্বপ্নই থাকবে সেই অজপোড়া গ্রামে পৌছে গেছে পেপসি কোলার ফেস্টুন কিংবা ছোট সাইনবোর্ড। শহর মত্ত নিশীথের সুরার ফোয়ারা থেকে নিস্তব্ধ গ্রাম্য নিশীথের নীলপূজার ঘট সর্বত্রই আজ বিশ্বায়নের থাবা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন দিনয াপন, পোষাক পরিচ্ছদ, লোকাচার - ধর্মাচার,শিশুর খেলনা থেকে বৃদ্ধের চশমা সর্বত্র বিশ্বায়নের বাজার সন্ধান। এবং সংগীত আজ এর সব থেকে বড় বাহন। শিশুর জন্ম কিংবা মৃতের শ্মশানযাত্রার সাথী যেমন ছিল সংগীত, ঠিক তেমনি রাজদ্বার থেকে শ্মশান সর্বত্র বাজার দখলে বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আজ সংগীত।

ভারতীয় সংগীতের প্রাচ্য পাশ্চাত্যের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন সর্বাগ্রে সেই রবীন্দ্রনাথ। সেখানে কিন্তু বাজার দখল করার সাম্র াজ্যবাদি কোনও অভীপ্সা কাজ করেনি। রবীন্দ্রনাথের গানের হাত ধরেই বাংলায় আধুনিকতার জন্ম সংগীতের ক্ষেত্রে। বাউল, ধ্রুপদ, কীর্তন এর সঙ্গে প্রয়োজন পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রন ঘটিয়ে বা এক একটিগানএক একটি অঙ্কের রচনা করে রবীন্দ্রনাথই এনেছিলেন সংগীতে এক চমৎকার আধুনিকতা।

আর আজ আধুনিকতা নামক বাক্যবন্ধ এবং নানান পরীক্ষা - নিরীক্ষার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে ও জনপ্রিয়তার অজুহাত দর্শিয়ে অ াখেরে বিশ্বায়নের সেবাদাসত্বই করেছে একদল শিল্পী।

এই দাসত্বজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে। বিলায়েৎ খাঁ সর্বকালের সেরা সেতারি এ প্রা বোধ করি মিমাংসীত। ওর শেষ উল্লেখ্য বাজনা ছিল ২০০৩ সালের ১০ নভেম্বর, সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানে। সে রাতে দরবারি কানাড়া শুনে যখন মুগ্ধ হয়ে মধ্যরাতে বা ড়ি ফিরছি তখন বার বার মনে হয়েছিল এঁরই মানায় পদ্মশ্রী - পদ্মভূষণ প্রত্যাখ্যান করাটা। শুধু প্রত্যাখান করা নয়, বিলায়েৎ বলেছিলেন পালোয়ানদের কোনও সংগঠন তাকে খেতাব দিলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন। কেননা ওরা অন্তত একটা ব্যাপার, ওই প ালোয়ানিটি ভাল জানে। কিন্তু যারা আমাকেপুরস্কার দিচ্ছে তারা কিছুই জানে না। একদিন শাহেনশার মুকুট ভারত সরকার রূপী শ াহেনশাকেই ফেরৎদিয়েছিলেন উৎপল দত্ত। চরম অনটন এবং হতাশার মধ্যে দাঁড়িয়েও শিশির ভাদুড়ি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন পদ্মশ্রী। অ ার আজশিল্পীরা যে কোনও পুরস্কার পাওয়ার জন্য যে কোনও ভাবেই লালা ঝরাতে রাজী। এই যে হ্যাংলা বিশ্বায়নের বাজার দখলের অচেতন থেকেই এর জন্ম। আজ যে কোনওপ্রকারে স্বীকৃতি আদায়ের জুন্য সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেমন লালায়িত, তেমনি সেই একটা সময় ছিল যখন পুরস্কার ব্যাপারটাই ছিল অলীক কুনাট্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

আমি পুরস্কার দান বা পুরস্কার গ্রহণের সামাজিক অভ্যাসের বিরোধি নই। কিন্তু প্রাইজ, প্রাইজমানি, রিবেট, একটা কিনলে একটা ফ্রি এ স্বাদে মন ভরে না এ স্বাদে ভাগ হবে না জাতীয় ব্যাপার একটি আর একটির সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত। আর পুরস্কার নিয়ে লবি করাটা এখন দিবালোকের মতন স্পষ্ট। নোবেল থেকে নবকুমার স্মৃতিপুরস্কার সর্বত্র এই লবিং। সুতরাং পুরস্কার যিনি পাচ্ছেন যিনিই এর প্রকৃত এবং একমাত্র দাবীদার, এব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা আর মূর্খের স্বর্গরাজ্যে বাস করার মধ্যে বোধহয় কোনও ফারাক নেই।

সংগীতের ক্ষেত্রে অবশ্য পুরস্কারের তুলনায় বাজার দখল করাটাই বড় কথা। এবং সেই দখলের ভিতর দিয়ে এমন একটা সাংস্কৃতিক ব াতাবরণের নির্মাণ ঘটান যার ফলে ধ্রুপদ ধামারের দিকেও যাবে না আবার ভাদু টুসু গম্ভীরা বাউলের দিকেও যাবে না। অথচ এইসব গান যে কত জনপ্রিয় তার গায়কির শুনে তার দুটি উদাহরণ দেব। উদাহরণ দুটি আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত (৮মে ২০০০) আমার লেখা একটি উত্তর সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃত করা। কাহিনী দুটি প্রনবেশ সেন বলেছিলেন। এম. এস. শুভলক্ষ্মী শান্তিনিকেতনের সম াবর্তনে দেশিকোত্তম নিয়ে যে কামরায় ফিরছিলেন সেই কামরায় ছিলেন বেতারের প্রনবেশ সেন ও উপেন তরফদার। কামরায় বসে ওর া টেপরেকর্ডারে সেই গানটাই বাজাচ্ছিলেন যেটি তিনি গেয়েছিলেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। শুভলক্ষ্মী আকৃষ্ট হন এবং চলে আসেন। আল াপচারিতা শু হয়। পরপর গান গেয়ে যেতে থাকেন শুভলক্ষ্মী। চাওয়ালা বসে পড়ে, বাদামওয়ালা, জলওয়ালা, ফলওয়ালা, ঝ ালমুড়িওয়ালা সকলে বসে পড়ে যে যার বেচাকেনা ফেলে রেখে। ওরা কেউ শুভলক্ষ্মীর নাম শোনেনি, কেউ নয় তেমন করে রবীন্দ্রসঙ্গ ীত বা মার্গ সঙ্গীতের ভক্ত। তবুও সেই মুগ্ধতা ছিল কিসের জন্য ?

দ্বিতীয় উদাহরণটিও প্রণবেশ সেনের। নদীয়ার কোনও এক গ্রামে লালন উৎসব হত। সেই উৎসবে লালন ছাড়া অন্য কারো গান গ াওয়া চলত না। দুই বাংলা থেকে অন্তত শ পাঁচেক গায়ক এতে অংশ নিতেন। সারা রাত অনুষ্ঠান চলত। গ্রামের সমস্ত ঘর থেকে সকলে চলে আসত ওই লালন গান মেলায়। সারা রাত গান শোনার পর ভোরে বাড়ি ফিরত। ওই লালন উৎসবের উদ্যোক্তাদের প্রনবেশবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যতীন, সব ঘর খালি করে দিয়ে সকলে যে চলে আসে চুরিটুরি হয় না যতিন বলেছিলেন কে চুরি করবে? গ্রামের সব চোরেরাও তো গান শুতে এসেছে।

ঝিায়নের ধবজাধারি বহুজাতিকরা শুভলক্ষ্মীদের বাজারও গ্রাস করেছে আবার লালন গায়কদের বাজারও কব্জা করেছে। কব্জা করেছে নানা উপায়ে। চরিত্র বুঝে কোয়াটাম বুঝে পন্যবিপনি খুলবে। আথিক সাহায্য পেয়ে শুভলক্ষ্মী এবং লালনেরা প্রথমে কৃতজ্ঞ, পরে মুখাপেক্ষি হবে বহুজাতিকের। তারপর একসময় ওদের কথানুযায়ীই চলবে শুভলক্ষ্মী লালনেরা। শুভলক্ষ্মী লালনদের ভারচুয়ালি কিনে নেবে বহুজাতিকরা। যেমন কিনে নিয়েছে ওরা শিল্পীদের। ধ্রুপদশিল্পী থেকে ছৌশিল্পী পর্যন্ত। কিন্তু সবাইকে কিনবে না। কয়েকজনকে কিনবে এবং বাজারে এনে ফেলবে। বাকিরা থাকবে অনাদরে অবহেলায়। এমন একটা অবস্থা তৈরি করবে যেখানে লালন মেলা ওরা স্পনসর করবে, নইলে কোনও লালন মেলা আর হবে না। কিছু উচচাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীকে ওরা স্পনসর করবে। বাকীরা টিউশানিকরে সঙ্গ ীত চর্চা চালাবে। এইটা একটি দিক। যে দিকে তারা আমাদের সংস্কৃতির গভীরে বিস্তার চালাবে। এবং চালাবে প্রায় নি শব্দে।

কিন্তু এটাই যে একমাত্র দিক নয় তা পাঠকমাত্রেরই জানা। আমাদের হাজার বছরের পুরনো সঙ্গীতচর্চার ঐতিহ্যকে লাটে তুলে দিয়ে সঙ্গীতের নামে যা এখন বাজারে চলছে এবং সেই গান নামক বস্তুটির ভিডও ক্যাসেট নামক উল্লুকমার্কা যে সব দ্রব্য মেট্রোরেল সহ সমস্ত রেলস্টেশন এবং অগনিত টিভিচ্যানেলে দেখানো হয় এবং যারা আমরা প্রোগ্রামে গিলি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে তা একদিকে যেমন নতুন এক বিপুল বাজারের জন্ম দিচ্ছে, তেমনি শিক্ষা সংস্কৃতি চির জগতে তুমুল বিপর্যয় ঘটিয়ে বহুজাতিকের বাজার অবারিত করার সড়ক নির্মাণ করেছে। এই সড়ক দিয়ে হাঁটার অভ্যাস একবার তৈরি হলে সে প্রজন্ম আর তাকাবেনা মার্গ সঙ্গীত কিংবা রবীন্দ্র সঙ্গীত অথবা বাউল, তরযা, গম্ভীরা, সওয়াই, ভাদু-টুসু, আলকাপ, ছৌ গান কিংবা আখড়াই কবি লড়াইয়ের দিকে। আর এইসব এল াকা থেকে বিমুখ হয়ে যারা উন্মত্ত হবে শরীরী প্রদর্শনাচে এবং নানান উদ্ভট শব্দ সম্ভারে জীর্ণ ধবস্ত সংগীত নামক এক অদ্ভুতে তারা অস ামাজিক বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে যথার্থ সমাজবিরোধী হতে বাধ্য। গুণ্ডা, চোর, ছিনতাইবাজ, খুনীদেরই প্রচলিত অর্থে সম াজবিরোধি বলা হয়। কিন্তু এই জাতীয় সাঙ্গিতিক চর্চা যে সমাজবিরোধিদের জন্ম দেয় তারা চোর, গুণ্ডাদের থেকেও ভয়ঙ্কর। কেননা চে ারগুণ্ডারা সময়কালে সমাজবিপ্লবে সামিল হতে পারে, কিন্তু এরা এইভাবে জারিত প্রজন্ম কোনওদিন কোনওভাবে কোনও সচেতন কর্মকাণ্ডে সামিল হবে না।

মনে রাখতে হবে। এইসব সাঙ্গিতিক আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য কিন্তু পণ্য বিত্রি। এইসব গান আসলে মাল বেচার নকশা। ঐ জাতীয় উল্লুকমার্কাগানের সঙ্গে বহুজাতিক পণ্যের বিজ্ঞাপনের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্য রয়েছে নতুন গড়ে ওঠা সংস্কৃতির। তাদের ওঠা বসা হাটা চলা মাতৃভাষা বিবর্জিত কথাবলা সবই একসূত্রে গাঁথা। তাই ঐ ভিডিও ক্যাসেটগুলি বহুজাতিক পণ্যবিপনির আবাহনী সংগীত, বহুজাতিক বাজার নির্মানও তেজি রাখার মার্চিং সঙ্।

সেইসঙ্গে বলা উচিত বাংলা ব্যান্ডবা রিমেক নিয়েও কিছু কথা। আজ থেকে কয়েকযুগ আগে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল মাইহার ব্যাণ্ড। যেখানে মার্গ সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতের সমন্বয়ে এক আশর্চ্য ঐকতান গড়ে উঠেছিল। যদিও সে ঐকতান

ভেঙ্গে গিয়ে ইনডিভিজুয়াল রবিশঙ্কর, ইনডিভিজুয়াল আলি আকবর খাঁর উদয় হয়েছে। তাঁরা পরম সমাদরে বহুজাতিকের বাজারে অ
ালো করেছেন, তাঁদের ব্যক্তি প্রতিভার আলোও ছড়িয়ে পড়েছে দশ দিগন্তে। ব্যাণ্ড তেমনভাবে থাকেনি। কিন্তু প্রতিভার নিরিখে সাঙ্গি
তিক সম্পদের নিরিখে মাইহার ব্যাণ্ডের সঙ্গে আধুনিক কোনও ব্যাণ্ডের তুলনা হাস্যকর বললেও কম বলা হবে। ব্যাণ্ড কথাটাকে হয়তো
এরাধার করেছেন মাইহার ব্যাণ্ড থেকে তার নখের যোগ্যতা থাক বা না থাক।
গানের তিনটি সম্ভার থাকে। গানের সুর, গানের কথা, গানের গায়কি। এর ব্রহস্পর্শ ঘটলেই গান gunনা হয়ে গান হয়ে ওঠে। মার্গ
সঙ্গীতের সূতিকাগৃহই নির্ধারণ করে দিয়েছিল তার ভষা। মার্গ সঙ্গীত তাই ঈশ্বর আশ্রয়ী। ভক্তিরসের প্লাবন সেখানে অনেক সময়েই তাই
অপ্রতিরোধ্য। লোকসঙ্গীতের জন্ম কথায় এবং সুরের নিরীখে গ্রামীন সভ্যতার গর্ভ থেকে। তার রীতি একেবারেই নিজস্ব এবং অভিনব।

বাংলা ব্যাণ্ডের সমগ্র স্টাইলটাই ঔপনিবেশিক। তাদের বাদ্যযন্ত্র, তাদের গানের ঢঙ, তাদের কথা সবই মাটি থেকে বেশ খানিকটা
উপরে (বা নীচে)। সর্বোপরি তাদের যোগ্যতা নিরিখে এবং মিউজিকে এমনটা একেবারেই নয় যে তারা এই মাপের বাজার পেতে পারে।
তোমার দেখা নাই রে... কথাটা প্রায় বার কুড়ি একটা গানের ভিতর এবংং সেগান হিটস্ব হিট হয় কোন উপকরনে তা না ভাবলে, এবং
না ভেবে যা কিছু জনপ্রিয় তারই পিঠ চুলকাতে শু করলে আমাদের পৌছতে হবে আনমনায় কোন কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে। এই ব্যাণ্ডগুলি স
াঙ্গিতিক প্রতিভার নিরীখে একেবারে মিডিও কার, লিরিক অত্যন্ত সাদামাঠা অথচ এরা দখল করেছে বাজার কার কাঁধে চেপে? এই
প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া খুবই জরী। একদা একজন হেমন্তকুমার বা একজন কিশোরকুমার ছিলেন তালিম ছাড়া বিখ্যাত। এখন বিখ্যাত ব্য
াণ্ডগুলি তো তালিমহীন গায়কদের আখড়া। এরা আবার তাদের গানকে বিকৃত করে মাঝে মাঝে পরিবেশন করে যারা অভুক্ত থেকেও
বংশপরম্পরা লোকসঙ্গীতের ঘরানা বাঁচিয়ে রেখেছে। বহুজাতিকরা একহাতে gun এবং অন্যহাতে গান নিয়ে দখল করছে বাজার
এইসব নানান উপকরণ সহ।